Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-IV, July 2026, Page No. 12-18
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.04W.112

সমরেশ বসুর ছোটগল্পে অন্ত্যজ নারীরা

ড. মহ. আসফাক আলম, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সোনারপুর মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.05.2026; Accepted: 11.06.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Samaresh Basu, writing also as Kalkut, entered Bengali literature with a rare immediacy – emerging not through gradual evolution but as a fully-formed novelist. His creative world is shaped by lived experience and a deep, almost instinctive, engagement with life. Nowhere is this more vividly realized than in his short stories, where stark social realism breathes with emotional intensity.

His years at the Ichhapur Gun Factory placed him among laborers and the dispossessed, allowing him to witness life at its most unadorned. He did not merely observe; he absorbed. The rhythms of hardship, hunger and survival became part of his inner landscape. As a result, his stories illuminate lives often dismissed as insignificant, revealing instead their quiet resilience and inherent dignity.

Samaresh Basu's fiction does not turn away from darkness. Desire, violence, deprivation, and moral ambiguity flow through his narratives, not as distortions, but as essential elements of existence. Within this shadowed terrain, however, flickers a persistent yearning for light, giving his work a deeply human tension.

His women, in particular, stand out – figures shaped by struggle yet never stripped of agency or depth. He portrays their sexuality with rare candor, free from judgment or ornamentation. With subtle restraint, he captures the essence of their inner lives, allowing their humanity to emerge unforced and luminous.

In this fusion of realism and sensitivity, Samaresh Basu crafts a literature that is both grounded and evocative. His work ultimately becomes an ode to human endurance, where even the most marginalized lives pulse with meaning and grace.

Keywords: Social realism, subaltern studies, gender discourse, female subjectivity, sexuality, humanism

বাংলা সাহিত্যে 'কালকূট' নামে খ্যাত সমরেশ বসুর আবির্ভাব সরাসরি ঔপন্যাসিক রূপে। এমনটা সচরাচর ঘটে না। তবে কথাসাহিত্যিক রূপে তাঁর শিল্পীসত্তার মূলে রয়েছে বাস্তব ও বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা-লব্ধ আত্ম উপলব্ধি। এই বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা ও জীবন পিপাসা যথার্থ ভাষারূপ পেয়েছে তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলিতে। এর পাশাপাশি তিনি তাঁর ছোটগল্পের জগৎকে গড়ে তুলেছেন রূঢ় বাস্তবতার ভিত্তিতে। ইছাপুর গান ফ্যাক্টরির এক কর্মী হিসেবে সেখানকার কর্মচারী, খেটে খাওয়া মানুষ, সমাজের নিচে থাকা মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন তিনি। হয়ে ওঠেন তাদেরই একজন। শিল্পাঞ্চলের

নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন, গৃহহীন, সর্বহারা অসংস্কৃত, অমার্জিত জীবনের পারিপার্শ্ব থেকে তিনি জীবনের বৈচিত্রতায় সম্পৃক্ত হন। এই মানুষগুলোকে বেঁচে থাকার জন্য, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যে অনবরত জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয় লেখক সেই অভিজ্ঞতা শারীরিক ও মানসিকভাবে অর্জন করেছিলেন। তার ফলে উচ্চশ্রেণির মানুষের চোখে এই তুচ্ছ সাধারণ, ঘৃণিত, অন্ত্যজ মানুষগুলো সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি ও জীবন অভিজ্ঞতা সহানুভূতির স্পর্শে গল্পের আখ্যানে মানবিক আবেদন সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। আর সেই প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই চলে এসেছে জীবনের আদিম অন্ধকার দিকের কথাও। কিন্তু এই অন্ধকার তো জীবন বিচ্ছিন্ন নয়– বরং জীবনেরই অংশ। জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আলোর জন্য ব্যাকুলতাই অন্ধকারের কথা বলাতে চায়। ফলে চলে আসে নর-নারীর জীবন তৃষ্ণার কথা। পারস্পারিক ভোগাকাঙ্ক্ষার কথা। তাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায় নীচতা, যৌনতা, দৈন্য, ক্রোধ, হিংসা। আর তার মধ্য থেকেই লেখক সার্থক জীবনবাদী শিল্পী হিসেবে তিলে তিলে তিলোত্তমা করে গড়ে তোলেন নারী জগৎ- নারীর মানবিক মুখ। তাঁর গল্পের নারীরা আর্থসামাজিক সংকটের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েও মানবিক মানসিকতাকে বিসর্জন দেয়নি। তাদের জীবন সংগ্রাম, নীচতা, যৌনতার মধ্যেও ফুটে উঠেছে মানবিক আবেদন। আমার 'সমরেশ বসুর ছোটগল্পে অন্ত্যজ নারীরা' প্রবন্ধে আমি গতর খাঁটিয়ে বেঁচে থাকা ও সংসার টিকিয়ে রাখা অন্ত্যজ নারীর মানবিক মুখ ও তার স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি– যা অনালোচিতপূর্ব বলে আমার মনে হয়েছে।

মোপাসাঁ, তুর্গেনিভ, দস্তয়েভস্কি প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মতো একাধিক নারীর সঙ্গে সমরেশ বসুর মিতালি গড়ে ওঠে, তাদের সংস্পর্শে আসেন তিনি, পান নারী-সান্নিধ্য। এই নারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে তিনি মেলামেশাও করেন। এদের মধ্যে যেমন ছিল উচ্চবিত্ত, উচ্চশ্রেণি, অভিজাত নারী তেমনি ছিল নিম্নবিত্ত, খেটে খাওয়া, অন্ধকার গলির প্রান্তিক অন্ত্যজ নারীরাও। তবে তাঁর এই নারী-ঘনিষ্ঠতার একটা সুনির্দিষ্ট সীমা ছিল এবং তা তাঁর নিজের রচিত। তিনি সেই নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই বিচরণ করেছেন। সীমা ছাড়িয়ে যাননি– গণ্ডী অতিক্রম হয়নি কখনও। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যিক নিতাই বসুর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে–

> "কোনো নারী তাঁর মনে দীর্ঘস্থায়ী আশ্রয় পায়নি, কারণ একমাত্র লেখা ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে তাঁর প্রেম ছিল না। তাঁর শিল্পীসত্তায় ছিল একটা বোহেমিয়ান আস্থিরতা। যৌনজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের নেশায় বুঁদ হয়ে প্রতিভার অপচয় ঘটাতে এই আজন্ম বৈরাগী শিল্পীর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।"[১]

তিনি নারীর সঙ্গে ততটা মিশেছেন যতটা তাঁর প্রয়োজন এবং তাঁর শিল্পের জন্য প্রয়োজন। নারী জীবনকেন্দ্রিক অতল সলিলে নিজেকে নিমজ্জিত করেননি। বরং ডুবুরি হয়ে ডুব দিয়ে অমৃত তুলে এনেছেন। আর এখানেই তিনি বিশ্বসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখকদের থেকে ব্যতিক্রমী। তাঁর এই নারীরা যৌনজীবন ও যৌনবোধ সম্পর্কে খোলামেলা, পরিচ্ছন্ন, অনাবিল, পরিশুদ্ধ। এই বলিষ্ঠ জীবনবোধের আধারেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন মানবিকবোধ। দরিদ্র, অশিক্ষিত, শ্রমিক, খেটে খাওয়া নারীদের গুপ্ত মানবিক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি তাঁর গল্প আখ্যানে। এই বিষয়টিকে তুলে ধরতে গিয়ে আমি লেখকের যে গল্পগুলি নির্বাচন করেছি সেগুলি এইরকম– প্রতিরোধ, শান্তিপ্রিয়, উত্তাপ, ছেঁড়া তমসুক, শুভ্র-সন্ধ্যা-সংবাদ প্রভৃতি।

তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত সমরেশ বসুর অনন্য জীবনধর্মী গল্প 'প্রতিরোধ'। এই গল্পে লেখক জীবনের দুটি দিককেই তুলে ধরেছেন– কাম ও প্রেম, সংরাগ ও বৈরাগ্য, ঘর ও বাহিরকে। গড়ে তুলেছেন অতুলনীয় করে। জোতদার, জমিদারের ও তাদের তৈরি করা প্রশাসনের অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে পুরুষের সঙ্গে নারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ। রুখে দাঁড়িয়েছে ভূমি সন্তান

কৃষকদের রক্ত জল করে লালন করা সোনালী ধান লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে। এখানে নারী ও ধরিত্রী একাকার হয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের গোড়ার কথা ব্যক্ত করেছে। রাধার সন্তানহীনতার কান্না ও জোতদারের ঘরে সন্তান-তুল্য অর্ধেক ফসল তুলে দেওয়ার বেদনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কৃষকেরা অধিকার আদায়ের লড়াই শুরু করে। আজ তারা চিরটাকাল ধরে চলে আসা জোতদারের ঘরে ফসলের অর্ধেক তুলে দিতে নারাজ। এবার থেকে তারা ফসলের তিনভাগের দু'ভাগ নেবে– যা তাদের হক, ন্যায্য প্রাপ্য। তবে জোতদার সোনা মিয়াঁ, পীতাম্বর, জহরুদ্দিনের শোষণ কাঠামো ভেঙে ফেলা সহজসাধ্য নয়। এই সময় সুবলের মন্বন্তরের গান গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষের মনে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের আগুনকে উদ্দীপিত করে। পরিণতিতে জোতদার ও প্রশাসনের যৌথতায় নেমে আসে চিরাচরিত চরম অত্যাচার।

কৃষকদের জমি সোনার ফসলে ভরে যায়। তা দেখে তাদের হৃদয় আনন্দিত হয়, হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। অন্যদিকে নিজেকে বন্ধ্যা ভাবা রাধা নিজের স্ফীত জটরে মুগ্ধ বিস্ময়ে গভীর মমতায় হাত বুলিয়ে অনুভব করে সন্তানের হৃদস্পন্দন। সে পাঁচ মাসের গর্ভবতী। রাধা মাতৃত্বের আনন্দে আনন্দিত, মনাই পিতৃত্বের, সুবল বন্ধুর আনন্দে। এদিকে ধানকাটার পালা শেষ হয়। কৃষকের মনে আনন্দ। গোলা ভরে ওঠে সোনার ফসলে। কিন্তু এই আনন্দ হিংস্র লোভী জোতদারদের সহ্য হওয়ার নয়। তারা হিংস্র কুটিল বিষদাঁত নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কালো অন্ধকার থেকে। কৃষকেরা সমিতির ঘরে জড়ো হয়। পরিকল্পনা করে আসন্ন আক্রমণ প্রতিরোধ করতে। শেষ রাতে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে পীতাম্বরের দলবল কৃষক সমিতির ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। গ্রাম জ্বলতে থাকে হিংসা ও লোভের আগুনে। শুরু হয় কৃষকদের সংঘবদ্ধ সংগ্রাম। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুরুষেরা। আর পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসে অন্ত্যজ নারীরাও। তারা সংগ্রামের রসদ যোগান দেয়। মাঠের ফসলে গোলাভরা ধান পাহারা দিতে থাকে রাধারা। গর্ভবতী রাধাকে ছেড়ে যেতে মনাইর মন চায় না। তখন রাধা তাকে নিশ্চিন্ত করতে বলে –

> "আমি শিবদাস মোড়লের মাইয়া না? ধান কাড়ুবনি আমার কাছ থেইক্যা? কত মায়ের দুধ খাইছে ঢ্যামনারা দেইখ্যা লমু। তুমি যাও গা– দেরি কইরো না।"[২]

রাধা তাকে জোর করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রতিরোধে সামিল হতে উদীপ্ত করে। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গ্রাম ছাড়ে পুরুষেরা। মেয়েরা, মায়েরা রণরঙ্গিণীর রূপ ধারণ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার- ধানের গোলা পাহারা দিতে থাকে। ভোর রাতে জোতদারের লোভী নেকড়ে, জানোয়ারের দল গ্রামে আক্রমণ চালায়। মেয়েরা দা, কুড়াল, লাঠি নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নেতৃত্ব দেয় রহিমের বউ কুড়ুল হাতে। নৃশংস রূপ ধারণ করে তারা। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। তারা গণধর্ষণের শিকার হয়। গোলার ধান বাচাতে গিয়ে তাদের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকে গোলা আগলে। মানুর বউ নগ্ন হয়ে ছুটে। শেষ রক্ষা হয় না। বীভৎসভাবে ধর্ষণের শিকার হয়। পীতাম্বর সা পুলিশ নিয়ে গ্রামে ঢুকলে রাধার চিন্তায় সুবল ও মনাই ছুটে আসে গ্রামে। রক্তাক্ত রাধাকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে অক্ষত ধানের গোলার সামনে। পীতাম্বর সা'র পোষা জন্তুর দল রাধা ও তার গর্ভের সন্তানকে ছিন্নভিন্ন করেছে। অক্ষত গোলা আগলে ক্ষতবিক্ষত রাধা পড়ে থাকে। নিজের প্রাণ, গর্ভের সন্তানের মূল্য দিয়ে ধান, ফসলের গোলা রক্ষা করেছে। অত্যাচার, যন্ত্রণা সহ্য করেও মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধে সজীব হয়ে উঠেছে। আর যে মানবিক চেতনাকে সে জাগিয়ে গণজাগরণ ঘটিয়েছে তাতে জোতদারেরা আর অত্যাচার, শোষণ করার সাহস পায় না। পীতাম্বর সা'র পিছু পিছু তার পোষা জন্তুরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়।

আর্থসামাজিক সংকট ও অবক্ষয়ের চরম রূপ লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'শান্তিপ্রিয়' গল্পটিতে। শান্তি লাভের পথ ও ধরণ ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে মানুষ মাত্রই শান্তি পেতে চায়– এটা যেমন ধ্রুব সত্য তেমনি অনেকে নিজের শান্তির জন্য অপরের প্রতি অত্যাচার করে থাকে। অশান্তির পরিবেশ তৈরি

করে। অন্যদিকে আর্থসমাজের কিছু মানুষ কোনো কিছুতেই নিজেকে জড়ায় না। সমস্যা থেকে নিজেকে সচেতনভাবে সরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। তারা আর্থসমাজের সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন, নির্লিপ্ত। তার ফলে যারা অশান্তির ধারক-বাহক ও সংক্রামক তারা বুক ফুলিয়ে বিচরণ করে। উত্তরোত্তর তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে অশান্তিও। তবে যারা বিবেকবান মানুষ, সচেতন নাগরিক, অন্যায়ের প্রতিবাদী মানসিকতা লালন পালন করেন তারা নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না। প্রতিবাদী সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং তা ঘটে নানা রূপে। গল্পে দেখা যায় শান্তিপ্রিয় আর্টিস্ট বাসে উঠতে গিয়ে দেখে তিন ফুট প্যান্ট ও দেড় ফুট জামার বোতাম খোলা এক ছোকরা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। সে কোনোরকম ঝামেলা না করে দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে চলে যায়। এরপরে প্রায় পঞ্চাশ বছরের এক লোক বাসে উঠতে গিয়ে ধমকের সুরে ছেলেটাকে বলে –

> "দরজায় দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে যাওয়া যায় না? ভেতরে তো অনেক জায়গা। উঠুন, না হয় নেমে যান। ... কী হল, আমাকে উঠতে দিতে হবে তো! ... তিন ফুট প্যান্ট, দেড় ফুট জামা নেমে দাঁড়াল।"[৩]

কিছুক্ষণ বাস দাঁড়িয়ে থাকার পরে সেই ছেলেটা বাস ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দেয়। বোঝা গেল বাস দাঁড়িয়ে থাকার কারণ। এবার সে সেই ভদ্রলোকের সামনে আসে। তার বুকের কাছে জামা মুচড়ে ধরে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে– মেয়েদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার মিথ্যা অভিযোগের বাহানায়। তিনি আর্তনাদ করে ওঠেন। কিন্তু বাসভর্তি ভীত মানুষগুলোর মুখে কোনো কথা নেই– সবাই শান্তিপ্রিয়, ঝামেলায় জড়াতে চায় না। গন্তব্যের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করে। কিন্তু শান্তিপ্রিয় আর্টিস্ট নিজেকে স্থির রাখতে পারছেন না। এই আঘাত যেন তার গায়ে এসে পড়ছে। এমন সময় একটি মেয়ের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। বলে যে, 'উনি তো আমাদের কাউকে অসম্মান করেননি। বেইজ্জতি করেননি। উনাকে মারছেন কেন!' মেয়েটির বীরাঙ্গনা রূপ দেখে শান্তিপ্রিয় আর্টিস্ট নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। মেয়েটি তার ভিতরের প্রতিবাদী কথাগুলি বের করে আনলো। এবার ছেলেটা ভদ্রলোককে ছেড়ে আর্টিস্টকে ধরে টেনেহিচড়ে মারতে মারতে বাস থেকে নামালো এবং বাস ছেড়ে দিতে আদেশ দিলো। এলোপাথাড়ি মারে শরীর ও জ্ঞান নিস্তেজ হয়ে আসছে তখন সেই বীরাঙ্গনা কয়েকজনকে নিয়ে আসে এবং সেই ছোকড়ার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে। আর্টিস্টকে বাঁচায় এবং হাঁসপাতালে নিয়ে যায়। যারা অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে না তুললে অশান্তি বাড়তে থাকবে। গল্পের সেই মেয়েটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুদ্র রূপ ধারণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছে। হয়ে ওঠেছে প্রকৃত শান্তিপ্রিয় মানুষ, মানুষের বিবেক।

'উত্তাপ' গল্পে দেখা যায় এক বাউরী-বাগদী নারীকে কেন্দ্র করে জমিদার পুত্র হরেন রায়ের যৌন আবেগ, নারী দেহ ভোগের অমার্জিত লোলুপতা। আর তার বিপরীতে সেই নারীর চরম মানবিক রূপ। হরেন সিউড়িতে কলেজে একই ক্লাসে আট বছর ধরে পড়াশোনা করে আর দুষ্টু সরস্বতীর পায়ে টাকা ঢালে। রলাটি স্টেশনে এসে দেখে তাকে নিতে বাড়ি থেকে গাড়ি আসেনি তখনও। মেয়েটার টানে অগত্যা সে তাদের সাথে সাত ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে যেতে থাকে। পথিমধ্যে ঝড়-বৃষ্টিতে তার হাড়ে কাঁপুনি ধরে, জ্ঞান হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়ে। ঠোঁটের কষ দিয়ে লালা গড়াই। তা দেখে ছুটে আসে মেয়েটা–

> "দু'হাত দিয়ে সাপটে ধরল হরেনের অচৈতন্য মুখ, ই কি বাড়াবাড়ি বাপু তোমার, অ্যাঁ? মানুষের জীবন, সে কি ছেলেখেলার জিনিস! ছেলেখেলা করতে এসে মানুষ এমনি করে মরণ ডাকে!"[৪]

বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে তাকে। বুকের কাপড় সরিয়ে নগ্ন বুকে মৃত্যু-শীতকে তপ্ত করতে থাকে। উত্তাপের চাপে চাপে গরম করতে থাকে। সুস্থ করে তুলে হরেনকে। এক স্বর্গীয় ভালোবাসায় বুকে টেনে তাকে বাঁচিয়ে তোলে। সেখানে কোনো স্বার্থ ছিল না। হরেনের মধ্যে যে উগ্র কামনা-যৌনসুখের আনন্দ ছিল– যার জন্য সে তার পিছু নিয়েছিল তা একনিমেশে অন্য ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়। মানুষের ভিতরে মানুষ জেগে ওঠে। ইতিমধ্যে গরুর গাড়ি এসে পড়লে হরেন তাতে চড়ে বসে। কিন্তু সেই জীবনদানকারী মেয়েটির কথা, তার অভিমানের কথা সে বুঝতে পারে না। মেয়েটির নগ্ন কোমল বুকের ঠিক অপর পিঠে যে অনুভূতিশীল হৃদয় রয়েছে তার হদিশ পায় না।

এক নারীর সংস্পর্শে তিন যুবকের মানসিক উত্তরণের গল্প হল 'ছেঁড়া তামসুক'। ছেঁড়া তমসুক শব্দের অর্থ হল ছিন্ন ঋণ স্বীকারপত্র বা ছেঁড়া বন্ধকনামা। তেইশ বছরের বিজলী ব্যানার্জী ওরফে বিজু আর্থিক অভাবে কলেজের পড়াশোনা চালাতে পারে না। কলেজ ছাড়তে বাধ্য হয়। টিউশনি করে কোনো রকমে সংসার চালাতে থাকে, জীবনধারণ করে। সুন্দরী বলে কলেজে তাকে নিয়ে ছেলেদের কৌতুহলের শেষ ছিল না। কিন্তু সে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেনি। অন্যদিকে সমাজ তার সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতে থাকে। তার তিন বখাটে ছেলে বন্ধু ছিল– নরেশ, প্রভাত ও শঙ্কর। তারা বিজুর সহপাঠী। তারা টাকার জন্য সব ধরণের কাজ করতে পারে। এর পিছনে ছিল তাদের আর্থিক দুরবস্থা, ভালোবাসার অভাব। কিন্তু বিজুর সংস্পর্শে এসে তারা সব ধরণের অসামাজিক, অপরাধমূলক কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নেয়। অন্যদিকে সে বন্ধুত্বের মূল্যে তার সবকিছু নিয়ে আত্মসমর্পন করে তাদের কাছে। তার সর্বনাশ, কলঙ্ক বন্ধক ছিল তাদের কাছে, বন্ধুত্বের কাছে। তারা প্রায় প্রতিদিন গণেশ ক্যাফেতে আড্ডা দিতো। এখানে বেকার যুবক, কলেজ ফেল করা, পড়তে না পাওয়াদের ভিড়। ময়লা পাজামা, ধূতি, প্যান্ট, ছেড়া জামা, উসকোখুসকো চুল আর হা-ভাতেদের একটা দঙ্গল লেপটালেপটি করতো সেখানে। আর সেখানে যেসব বিষয়ে তারা আলোচনার ঝড় তুলতো তা ছিল রাজনীতি, স্কুল কলেজ, খুন-জখম-মারামারি, প্রেম-ফুসলানো-হরণ, গান-বাজনা-থিয়েটার ইত্যাদি।

এক দিন রাতে হঠাৎ অধিকাংশ লোকের কাছে কলঙ্কিনী বলে পরিচিতা বিজু নিশি স্যাকরার আম বাগানের ধারে নর্থ ক্যাবিনের কাছে মালগাড়িতে কাটা পড়ে, সে আত্মহত্যা করে। ময়না তদন্তে বন্ধুরা জানতে পারে যে, বিজু প্রেগন্যান্ট ছিল। তারা তিন বন্ধুই তাকে ভালোবাসতো। আত্মহত্যা ও প্রেগন্যান্টের বিষয়টা তাদের স্তম্ভিত করে দেয়। বিজুর সঙ্গে তাদের দৈহিক সম্পর্ক ছিল না– ছিল নিখাদ বন্ধত্বের। তাদের কাছেই বাঁধা ছিল তার বন্ধুত্বের তমসুক। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ধারণা হয় যে, তাদের তিনজনের মধ্যে কেউ সেই তমসুক ছিঁড়েছে। তারা একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। গণেশ ক্যাফেতে তারা আত্মহত্যার কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজুর প্রতি তাদের মনের দুর্বলতার কথা এক এক করে প্রকাশ করে। তিনজনেই বিজুর কাছে ভালোবাসার কথা বলেছিল। কিন্তু বিজু তাদের তিনজনকেই শান্ত করে বলেছিল যে, তাদের তিনজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে ঘর বাঁধলে অন্য দুজনের সঙ্গে অন্যায় করা হবে। সে চায় তাদের চার জনের সম্পর্ক বন্ধুত্বেই সীমাবদ্ধ থাক। তাই ছিল আর সেভাবে জীবন চলছিল নিজের গতিতে।

রাতে গণেশ ক্যাফে বন্ধ হয়ে গেলে তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে যায় বিজুর আত্মহত্যার জায়গায়- নিশি স্যাকরার আম বাগানের ধারে। সেখানে এক ছায়ামূর্তিকে চলে যেতে দেখে তারা। পিছু নিয়ে ধরে ফেলে ব্রজেনকে। ব্রজেন পাল তাকে ভোগ করার জন্য কলেজ জীবন থেকেই তার পিছনে ঘুর ঘুর করতো। কিন্তু পুরুষের কামনা, সমাজের পাঁক থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে বিজু। চরম আর্থিক সংকট ঘনিয়ে আসে তাদের পরিবারে। দুবছরের বাড়ি ভাড়া বাকি। রাতের মধ্যে সাতশো টাকা না দিলে তাদেরকে

বাড়ি থেকে পথে ছুড়ে ফেলবে বাড়ির মালিক। বাধ্য হয়ে সে যে ব্রজেনকে ঘৃণা করে তার কাছে নিজের দেহ সঁপে দেয় মাত্র সাতশো টাকার বিনিময়ে। তারা ব্রজেনকে মেরে ফেলতে চাইলেও পারে না। ব্রজেনও চায় মরতে, চায় কেউ তাকে মেরে ফেলুক। চরম আর্থিক দুরবস্থার সুযোগে ব্রজেন তাকে ভোগ করলেও তার মনকে ছুঁতে পারে না। নিজের কাঙ্ক্ষিতকে কাছে পেয়েও তার মন না পাওয়ার অনুতাপে সে আজ উন্মাদে পরিণত হয়েছে। ছুটে চলে রেললাইনের দিকে। অন্যদিকে বিজু নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করতে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। সে তিন পথভ্রষ্ট যুবককে নিজ বৃত্তে আনে এবং সঠিক দিশা দেখায়। মানুষের বেঁচে থাকার চিরন্তন লড়াইয়ে সৎপথে তাদের চালিত করে। তাদের মানসিকতার উত্তরণ ঘটায়, মানবিকতার উত্তরণ ঘটায়।

'শুভ্রা-সন্ধ্যা-সংবাদ' গল্পে দেখা যায় প্রায় এক আর্থ-সামাজিক সংকটের পটভূমিতে বেড়ে ওঠা দুই পরিবারের সমবয়সী দুই মেয়ের ভিন্ন জীবনবোধ। সামাজিক নির্মমতা ও আর্থিক সংকটের হাত থেকে মুক্তি পেতে, সর্বোপরি জীবনে বেঁচে থাকতে তারা দুই বিপরীত পথের দিকে পা বাড়ায়। সন্ধ্যা সহজলভ্য, শহরের জাকজমকপূর্ণ জৌলুসে আকৃষ্ট হয়ে দেহোপজীবীনীর হাতছানিতে ধরা দিতে বাধ্য হয়। তবে তার বীজ বোপিত হয়েছিল নিজের বাড়িতেই। তার দুই দাদা রাজনীতি করে। সাথে দলাদলি, মারামারি করে, সমাজ বিরোধী হয়ে ওঠে। তাদের বন্ধুবান্ধব, সাঙ্গপাঙ্গরা সন্ধ্যার বারো বছর বয়স না পেরোতেই তার সঙ্গে যে খেলা খেলতে থাকে তারপরে সুস্থ জীবনের কথা চিন্তা করা বৃথা। তার মা এসব দেখেও দেখতেন না– প্রশ্রয় দিতেন। বিনিময়ে–

> "ভালো ভালো খাওয়ার খাওয়াত, ভালো শাড়ি জামা জুটত। হাতে কিছু নগদও আসত। মা আবার তা থেকে ভাগ বসাতে আসত। না দিলেই, নোংরা গালাগালি।"[৫]

পরিণতিতে অন্ধকার গলিতে যাতায়াত এবং সেখানে যৌনকর্মী হিসেবে বেলা বারোটা থেকে রাত দশটার চাকরি শুরু হয়। তার পথ অনুসরণ করে তার ছোট বোন দুজনও। এই পথে একবার পা গলালে তা থেকে বের করা বড় কঠিন। ক্রমে তলিয়ে যেতে থাকে– সহজে ফেরা যায় না। অন্যদেরও সে সেই পথে টেনে আনে তাদের দারিদ্রতা অভাব অনটনের সুযোগ নিয়ে।

সন্ধ্যার বিপরীত মানসিকতার অধিকারী শুভ্রা। সে দারিদ্রের মধ্যে থাকলেও সকাল সন্ধ্যা টিউশনি করে, অতি পরিশ্রম করে রোজগার করার পরিবর্তে বিপথে, অতি সহজভাবে রোজগার করার পথে পা বাড়ায়নি। সন্ধ্যার জোড়াজোড়িতে একদিন সে বেলা বউদির বালিগঞ্জের অভিজাত পাড়ার বাড়িতে তার সঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। সেখানে গিয়ে সে চাক্ষুষ করে এক অন্য জগৎকে। নারী ও পুরুষের দৈহিক লীলারঙ্গ, নানারঙের পানীয়ের ছড়াছড়ি, নানা ধরণের পারফিউমের উৎকট গন্ধ। সে সেখানে থাকতে পারে না। ছিটকে বেরিয়ে আসে। প্রত্যাখ্যান করে বেলা বউদির উপহার হিসেবে আগ বাড়িয়ে দিতে আসা পঞ্চাশ টাকা। তাদের পাতা সে পা দেয় না। সন্ধ্যাকে তার সঙ্গে আসতে হবে না বলে পা বাড়ায় রাস্তায়। সব ঝাপসা দেখে। ট্রেনে চেপে বাড়ি ফিরে। আর আজ প্রথম সে সন্ধ্যা বেলার টিউশনিটা যেতে পারে না। পরের দিন তার বাবার শরীর খুব খারাপ হয়। এমারজেন্সি ভর্তি করানো হয়। হঠাৎ সেখানে হাজির হয় সন্ধ্যা। বিপদের সুযোগ কাজে লাগাতে চায়। তাকে টাকা দিয়ে তার পথে আনতে চায়। কিন্তু তাকে বিপথে টেনে আনতে পারে না। টলাতে পারে না তার মানসিক দৃঢ়তাকে। সে সন্ধ্যাকে স্পষ্ট বলে যে, আমার বাবার অসুখে তোমার কিছু করার নেই। যা করার আমরাই করব। নিজেকে নর্দমায় জলে শুভ্রার মতো ভাসিয়ে দেয় না। জীবনে সুখ দুজনেই চেয়েছিল। কিন্তু শুভ্রা সুখের জন্য নিজের সব কিছুকে বিসর্জন দিতে পারেনি। সন্ধ্যা এই প্রথম চরমভাবে মানসিক হোঁচট খায় এবং আর আজ প্রথম বউদির বাড়ি যেতে তার মন চায়নি।

সমরেশ বসুর ছোটগল্পের ভিত্তিভূমিটি রচিত হয়েছে আর্থ-সামাজিক-পারিবারিক সংকটকে কেন্দ্র করে। এই সংকট তাঁর গল্প-আখ্যানের চরিত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। লেখক তাঁর গল্পে এই সংকটের ক্ষতস্থানকে চিহ্নিত করে ক্ষতের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন। উৎস মুখের সন্ধান দিয়েছেন। শুধু তাই নয় সেই ক্ষত সৃষ্টির উৎসমূলে কুঠারাঘাত করেছেন। এই সংকট মানুষের মানবিকতাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে, হীন করে তুলেছে মানসিকতাকে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর ছোটগল্প উত্তরণের কথা শোনায়, মানসিকতা নাড়া দিয়ে মানবিকতাবোধ জাগাতে চায়। আর এক্ষেত্রে তাঁর গল্পের নারীরা সবিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। দেখা যায় তাঁর গল্পের নারীরা অন্যায়, শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রমীলারূপে অবতীর্ণ হয়েছে। সশস্ত্র প্রতিরোধের সামনে অত্যাচারী জোতদার ও তার পোষ্য বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। সমাজ বিরোধীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যেখানে বাসভর্তি মানুষ ভয়ে তটস্থ হয়েছে সেখানে নারী ভয়কে জয় করে প্রতিবাদের ধ্বনি তুলেছে। আর্টিস্টের যে মানবিকবোধ গলায় এসে রুদ্ধ হয়েছিল তা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। নারী শুধু পুরুষের পাশে দাঁড়ায়নি- পুরুষকেও দাঁড় করিয়েছে তার পাশে, হাজির করেছে অন্যায়কারীর সম্মুখে। সমাজবিরোধীর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে নিরীহ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। উপযুক্ত চিকিৎসা করেছে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষের চেতনারও। আবার পথভ্রষ্ট যুবককে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও চারিত্রিক উদারতায়, দীপ্তিতে সঠিক পথে নিয়ে এসেছে। হীন মানবিকতা থেকে নির্মল মানবিকতায় উত্তরণ ঘটিয়েছে। যে পুরুষ তার দেহকামনা করে, তার প্রতি আকর্ষণের মূলে যে পুরুষের রয়েছে কেবল যৌন-সম্ভোগ– নারী একথা জেনেও মরণোন্মুখ সেই পুরুষকে বাঁচাতে নিজের বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। স্তন-বক্ষের তাপে তপ্ত করে বাঁচিয়ে তুলেছে। যেখানে আর্থ-সামাজিক সংকট পুরো সমাজকে গ্রাস করতে উদ্যত সেখানে অন্ত্যজ নারী তার মানবিক মুখ নিয়ে হাজির হয়েছে। মানসিক ও আত্মচেতনার দীপ্তিতে মানব সমাজে ক্ষয়িষ্ণু মানবিকতাকে পুনরুদ্ধারে মানসিক চেতনাকে জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছে। ফুটে উঠেছে তাদের মানবিক মুখ। হয়ে উঠেছে সমাজের জাগ্রত বিবেক। আর এখানেই লেখকের ছোটগল্পের অন্ত্যজ নারীরা হয়ে উঠেছে অনন্য।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, নিতাই। ভূমিকা, সমরেশ বসু গল্পসমগ্র ১। মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০২২, পৃ. ৯।
২. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার। গল্পচর্চা (সম্পাদিত)। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০১৪, পৃ. ১০৩৩।
৩. তদেব, পৃ. ৪৩।
৪. তদেব, পৃ. ১১৩।
৫. তদেব, পৃ. ৪৮৮।